
মজার গল্প
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ইউ. এন্. ধর য়্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ধর
ইউ. এন. ধর য়্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

চিত্রকর
শ্রীসমর দে

মুদ্রাকর
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

উপহার

....

....

....

....

এই গল্পটা পড়ে কতকগুলো কথা তোমাদের মনে হতে পারে, সেগুলো যদি তোমরা খুব ভালো করে বোঝাতে না পারো, তাই তোমাদের সুবিধের জন্যে সেই কথাগুলো আমিই এখানে বল্লাম—

জীবনে প্রত্যেক মানুষেরই নিজের শক্তি অনুযায়ী নিজের মতন করবার অনেক কাজ আছে। সেইটুকুই সন্তুষ্ট মনে করে যাওয়া প্রত্যেকেরই উচিৎ।

অনেক লোক, যারা আপনাদের খুব চালাক মনে করে, তারাও ঠকে এবং যখন ঠকে, তখন ভয়ানক রকমেই ঠকে, এবং যেখানে প্রথমবার ঠকেছে, বারে বারে সেইখানেই ঠকতে তাদের আপত্তি থাকে না।

আজ গল্পের মধ্যে এ-গুলো দেখছো...

একদিন সত্যিকারের জীবনের মধ্যেও দেখবে, এই কথাগুলো কতো বড়ো সত্যি। এমন সত্যি যে, তখন সন্দেহ হবে যে, যে-জীবনটা চোখের সামনে দেখছো, সেটা গল্প কিনা... আর যে-গল্পটা ছেলেবেলায় পড়েছো, সেইটাই সত্যি কিনা!

হয়ত দেখবে, জীবনের একজায়গায় এসে গল্প আর সত্যি এক হয়ে গেছে...মিলে-মিশে গেছে...এক নদীর জল আর এক নদীর জলের সঙ্গে যেমন মিলে-মিশে যায়।

গ্রন্থকার



এক

অনেককাল আগেকার কথা—

এক চাষার ছিলো দু' বিয়ে।

প্রথম বউটা ছিলো ভয়ানক বোকা—এতো বড়ো বোকা সে অঞ্চলে আর কোন মেয়েই ছিলো না।

বিরক্ত হয়ে চাষা আর একটা বিয়ে করে।

চাষার বরাৎ ভালো, সে বউটা হলো ভয়ানক চালাক।

বোকা বউটার সঙ্গে চালাক বউটার প্রায়ই ঝগড়া লাগতো।

ছোটো বউ যা বলতো—বড়ো বউ ঠিক তার উল্টো ধরে নিতো—যা করতে বলতো ঠিক তার উল্টো করতো।

কারণ, তার ধারণা হয়েছিলো যে, সর্ব্বদাই তাকে ছোটো বউ ঠকাচ্ছে।

বড়ো বউটার বরাৎ ভালো। ছোটো বউটার একবার ভয়ানক জ্বর হলো। সবাই বল্লে—"ছোটো বউ এবার বাঁচবে না।"

হলোও তাই।

দশদিন একটানা জ্বরে ভুগে এগারো দিনের দিন ছোটো বউএর শ্বাস উঠলো।

মরবার সময় নিকট হয়েছে দেখে তার একটীমাত্র ছেলে বুধুর জন্যে বড়োই মনটা কেঁদে উঠলো। মার প্রাণ কেমন করে সৎমার হাতে ছেলেকে সঁপে দিয়ে যাবে ?

সতীনেরও ছিলো একটী ছেলে, তার নাম ছিলো হুতুম।

বড়ো বউএর স্বভাব ছোটো বউ খুব ভালো রকমই জানতো। তাই সে মরবার সময় বড়ো বউকে ডেকে ইচ্ছে করে বল্লে—"দিদি, আমি তো চল্লুম, আমার বুধু রইলো। সে আর কি করবে, তাকে রোজ মাঠে হাল চষতে পাঠিয়ে দেবে—যা হয় দু'মুঠো খেতে দিও ;—আর, তোমার হুতুম বড়ো বুদ্ধিমান ছেলে—আহা, তাকে লেখাপড়া শিখিও, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখো, আর দেখো, তার খাবার-দাবারটা যেন একটু ভালো হয়। আমার শেষ কথাগুলো রেখো, দিদি।"

এই কথাগুলো বলার কিছুক্ষণ পরেই ছোটো বউটার দেহ অবশ হয়ে এলো। ধীরে ধীরে সে মরে গেলো। বড়ো বউটা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

ছোটো বউ মরে যাবার কিছুদিন পরে বড়ো বউ ছোটো বউ-এর শেষ কথাগুলো মনে মনে ভাবতে লাগলো—"নিশ্চয়ই এই কথা বলার মধ্যে তার মতলব আছে। তার ছেলে চাষের কাজ শিখবে—বোধ হয়, বড়ো হ'লে জমিজমা সব সেই ভোগ করবে—আর আমার ছেলে পাঠশালায় গিয়ে রোজ গুরু-মশাইএর বেত খাক্—আর অকেজো হোক। না, সে কখখনই হবে না। আমি ঠিক এর উল্টো করবো।"

একদিন বুধু আর হুতুমকে ডেকে বড়ো বউ বললো—"দেখ, বুধু আর হুতুম, তোমাদের বয়স হচ্ছে—তোমাদের আর বসে

থাকলে চলবে না। বুধু, তোমাকে রোজ পাঠশালে যেতে হবে—ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে, আর অতো ময়লা কাপড় পরে থাকলে চলবে না। আর বাছা হুতুম, তোমাকে কাল থেকে মাঠে গিয়ে লাঙ্গল ধরতে হবে—চাষের কাজ শিখতে হবে, বুঝলে ?”

ঠিক হলোও তাই।

কিন্তু এখানে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার। বুধু তার মার গুণ পেয়েছিলো—সে ছিলো তার মার মতোই চালাক। আর হুতুম পেয়েছিলো তার মার গুণ—সে ছিলো তার মার মতো বোকা কিংবা কারুর কারুর বিশ্বাস ছিলে যে, সে তার মার চেয়েও বোকা।

দুই

এমনি করেই দিন যায়—

বুধু পাঠশালে গিয়ে রীতিমত লেখাপড়া, জমা-খরচ, হিসেব-পত্র শেখে। তার জন্যে ভাল করে আলাদা রান্না হয়—তাই খায়। ফরসা জামা-কাপড় পরে, আর মনে মনে সৎমার প্রশংসা করে—আর অবাক্ হয়ে যায়।

ওধারে হুতুম রোদে-বৃষ্টিতে মাটী চষে, গরু তাড়ায়, গাছে চড়ে, মাঠে শুয়ে থাকে, যা দু'মুঠো পায় তাই খায়। সে ভাবে, চাষার ছেলের এই রকমই তো ভাগ্য।

যথাকালে বুধুর পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেলো—হিসেব-পত্র রাখার ব্যাপারে তার রীতিমত দখল হয়ে গিয়েছিলো।

এমন সময় সেই গ্রামে খাজানা আদায় করবার একজন লোকের চাকরি খালি হলো। গুরুমশাই-এর সুপারিশের জোরে বুধু সেই চাকরিটা পেয়ে গেলো। সবাই একবাক্যে চাষার ছেলের গুণের কথা বলাবলি করতে লাগলো।

এদিকে বুধু আর হতুমে বড়ো বেশী দেখা হতো না। একদিন খাবার সময় তাদের একসঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

হতুম দেখলো, তার বেলায় পাতে পড়লো পান্তা ভাত—আর বুধুর বেলায় গরম ভাত; তার বেলায় শুধু একপাত ভাত আর একটা চচ্চড়ী—আর বুধুর বেলায় মাছের মুড়ো!

এই অবিচার দেখে হতুমের ভয়ানক রাগ হলো। সে মনে মনে ভাবলো—"কি, সারাদিন আমি রোদবৃষ্টি সয়ে খেটে মরবো—আর উনি মজা করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন—আর আমি খাবো পান্তা ভাত, আর উনি খাবেন মাছের মুড়ো? আচ্ছা…"

সেদিন খাওয়া হয়ে গেলে হতুম মনে মনে কি একটা ভাবলো। তারপর মাকে আড়ালে ডেকে বল্লো—"দেখো, বুধু বাড়ী এলে তাকে বলো যে, আজ থেকে তার কাজ আমি করবো—সে যেন মাঠে গিয়ে হাল ধরে।" এই বলে সে কাছারী বাড়ীর দিকে চলে গেল।

বুধু বাড়ী এসেই তার সৎমার কাছে শুনলো যে হতুম তার জায়গায় কাজ করতে গেছে আর তাকে এখন থেকে মাঠে বেরোতে হবে। কোনও আপত্তি না করে বুধু মাঠে গেল—চাষার ছেলে হাল ধরতে ভুলবে কেন—মাটী চষে সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে এলো।

ওধারে হতুম কাছারী বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। তখন খাজনা আদায় হয়ে জমা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিলো। পাশের গাঁয়ে খাজনার

টাকার মোটটা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একজন লোকের দরকার হয়ে পড়লো। অথচ সেখানে সবাই কাজে ব্যস্ত।

হুতুম তার ময়লা কাপড়চোপড় পরে গম্ভীর হয়ে একদিকে বসেছিলো। তার দিকে সবার নজর পড়লো।

তহশীলদার হেঁকে বল্লে—"হাঁ হে চাষীর পো, মোটটা আর-গাঁয়ে পৌঁছে দেবে?"

হুতুম মনে মনে ভয়ানক রেগে গেলো। সে কোথায় এসেছে খাজনা আদায় করবার জন্যে, আর বলে কিনা তাকে মোট বইতে? সে গম্ভীর স্বরে জবাব দিলো—"ও সব হবে টবে না—"

চাষার ছেলের বেয়াদবি দেখে তহশীলদার হেঁকে উঠলো—"ব্যাটা চাষার ছেলের কথা দেখো—ওঠ বেটা, তোকে যেতেই হবে।

হুতুম দেখলো বিপদ। কি আর করে—অগত্যা সেই মোট কাঁধে করে তাকে চলতে হলো।

গ্রামটাও ছিল দূরে। মধ্যে ছিলো এক ভীষণ মাঠ। টাকা পৌঁছে দিয়ে হুতুম যখন বাড়ী এলো, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। যে যার খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। গায়ের ব্যথা গায়ে নিয়ে হুতুমও ঘুমিয়ে পড়লো।

তিন

পরের দিন সকাল বেলা দুই ভাইএ দেখা—

বুধু হুতুমকে বল্লে—"দেখো, একটা বিশেষ দরকারী কাজ আছে। আমার কাজ যখন তুমি করছো—এই টাকাগুলো আদায় হয়েছে, কিন্তু তহশীলে এখনও জমা দেওয়া হয়নি।

তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে গিয়ে তহশীলে টাকাগুলো জমা দিয়ে এসো।"

হতুম এবার মনে মনে গৌরব অনুভব করলো। হাঁ, এই তো তার কাজ। গত রাত্রের গায়ের ব্যথা সে ভুলেই গেলো। কাপড়ের খোঁটে কতকগুলো ধান বেঁধে সে তখখুনি বেড়িয়ে পড়লো।

তহশীলখানাটাও আবার অনেক দূরে কিনা—তিন-চারখানা গাঁ পেরিয়ে তবে তহশীলখানা। হতুম সুবিধের জন্যে টাকাগুলোও ধানের সঙ্গে বেঁধে নিলো।

একটা গাঁয়ে এসে হতুম ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ক্ষিদেয় তার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছিলো। এক গেরস্থর বাড়ীতে এসে দেখে যে দরজায় একটী বউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। হতুম এগিয়ে এসে ধানের পুঁটলীটা দিয়ে বল্লে—"আমায় এই ধান ক'টা ফুটীয়ে হুটী ভাত করে দেবে গা ?"

বউটী রাজী হয়ে পুঁটলীটা নিয়ে ভেতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে বউটি আবার ফিরে এসে হতুমকে জিজ্ঞাসা করলো—"হাঁ গো চাষীর পো, ধান তোমার কোটা না আকোটা ?"

হতুমের তখন ক্ষিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো। সে বল্লে—"যা আছে ঐ আছে, কোটা না থাকে, একটু কুটে নাও না ?"

বউটী আর কোন কথা না বলে চাষাকে বসতে দিলো—বাড়ীর ভেতর থেকে একটা হুঁকো এনে তামাক ধরিয়ে দিলো—হতুম দাওয়ায় বসে মনের আনন্দে তামাক ফুঁকতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মাথাটা যখন একটু ঠাণ্ডা হলো, তখন হতুমের টাকার কথা মনে পড়লো। গামছায় যে ধানের সঙ্গে টাকাও ছিলো।

বউটী আসতেই হুতুম বল্লে—"আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! ধানের সঙ্গে আমার টাকা বাঁধা ছিলো—আমার টাকা দাও!"

বউটী হেসে বল্লে—"তোমায় আমি জিজ্ঞেস করিনি যে, তোমার ধান কোটা না আকাটা? কই, তখনও তো তুমি কিছু



বল্লে না! তুমি কি বোকা গো?—আচ্ছা, তোমার টাকা আমার কাছে রইলো—কিন্তু যদি তুমি যাবার পথে দুটো গল্প আর আসবার পথে দুটো গল্প শোনাতে পারো, তবে তোমার টাকা তোমাকে দেবো—নইলে নয়।"

হতুম মহা-বিপদে পড়লো! সে তো একটাও গল্প জানে না। অথচ গল্প না বল্লে তো টাকা ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না। কি আর করে, সে টাকা না নিয়েই চল্লো। একবার তহশীল-খানায় দেখা দিয়েই আসা যাক। পথে যেতে যেতে হতুম ভাবতে লাগলো—"তাই তো তহশীলখানায় কি বলা যায়?"

এমন সময় পথে যেতে যেতে হতুম দেখলো যে, একটা ব্যাধ তীর ছুঁড়ে একটা হরিণ মারলো! মরা হরিণটাকে দেখে হতুমের বড়ো মজা লাগলো। কেননা তীরটা একই সঙ্গে হরিণটার একটা পা, একটা কাণ ও একটা শিংএ বিঁধেছিলো।

হতুম মনে মনে ভাবলো—এতো বড়ো আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই ব্যাপার সে তহশীলখানায় গল্প করলে সকলে অবাক হয়ে যাবে-খন নিশ্চয়ই।

কিছুদূর যেতে না যেতেই হতুম অবাক হয়ে শুনলো যে, তার মাথার ওপরে আকাশে কুকুর কাঁদছে। ভয়ে তার গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। এসব নিশ্চয়ই ভূত-প্রেতের কাণ্ড।

ভয়ে কিন্তু এধারে কাঁপছে, আর ওধারে মনে মনে ভাবছে যে, একবার তহশীলখানায় পোঁছতে পারলে হয়, সে এই সব ব্যাপার বলবে, আর তারা অবাক হয়ে যাবে।

অবশেষে হতুম তহশীলখানায় পোঁছলো। তখন ভয়ানক কাজের ভিড় ছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে হতুম চীৎকার করে বলে উঠলো—"হুজুর, আমার একটা কথা বলবার আছে।"

—"কি কথা শীগগির বলো!"

—"যে আজ্ঞে, লিখে নিন্ যে, আমি পথে আসতে আসতে একটা ভয়ানক আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিছি—একটা হরিণের একটা পা, একটা কাণ আর একটা শিং একই সঙ্গে একটা বাণ দিয়ে বেঁধা।"

কাজের ভিড়ের মধ্যে এই কথা শুনে তহশীলদারের মেজাজ গেল চটে। তহশীলদার রেগে বলে উঠলো—"কে এ পাগলটাকে এখানে ঢুকতে দিলে? এখনি বাইরে বার করে দাও ওকে!"

তিন-চারটে লোক এসে রীতিমত ভাবে হুতুমকে ধরে টানাটানি করতে লাগলো। হুতুম কিছুতেই যাবে না···

—"হুজুর, আর একটা কথা আছে···"

নাছোড়বান্দা দেখে তহশীলদার—"আচ্ছা, কি কথা বলো···ইয়ার্কি করিলে এবার মজা দেখতে পাবে···"

—"হুজুর, সোণাতলীর মাঠের আকাশে বাতাসে কুকুর কাঁদে!"

তহশীলদার রেগে লাল হয়ে হুকুম দিলো—"ব্যাটা বদ্‌মায়েস, পাগল সেজে এসেছে···মারতে মারতে ওকে বার করে দাও!"

চার-পাঁচজনে মিলে মারতে মারতে হুতুমকে তহশীল-খানার বাইরে এনে ফেলে দিলো।

চার

পরের দিন সকালবেলা—

হুতুম যে পথ দিয়ে গিয়েছিলো, সেই পথ দিয়েই মুখ চুণ করে বাড়ী ফিরে আসছিলো। পথে বুধুর সঙ্গে দেখা।

হুতুম ধান দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কথা বুধুকে বল্লে।

বুধু হেসে বল্লে—"এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছিলে তহশীল-খানায় কাজ করতে। আচ্ছা তুমি আবার দিনকতক বাড়ী থাক। আর দেখো, একটা বলদের ভয়ানক অসুখ হয়েছে, সেটা

বোধ হয় আর বাঁচবে না···তুমি এই টাকা দিয়ে একটা বলদ কিনে আবার জমি চাষ করোগে যাও!"

যাত্রা করবার আগে বুধু সেই রকম একটা গামছায় কতকগুলো ধান নিলো এবং সেই সঙ্গেই কতকগুলো পেতলের গিলটী-করা আংটী রেখে দিলো। গামছাটা কাঁধের ওপর ফেলে সে যে-পথ দিয়ে হতুম গিয়েছিলো, সেই পথে রওয়ানা হলো।

সেই বাড়ীটার সামনে এসে বুধু হাক দিলো। একটী বউ বেরিয়ে এলো। বুধু কাঁধের গামছাটা বউটীর হাতে দিয়ে বল্লে—"এই ধান দিয়ে দুটী ভাত ফুটীয়ে দেবে গা।"

বউটী রাজী হয়ে গামছাটা ঘরে নিয়ে গেলো। ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখে ধানের ভেতর সোণার আংটী। বউটী বেরিয়ে এসে আগেকার মতো জিজ্ঞাসা করলো—"তোমার ধান কোটা না আকোটা।"

বুধু বল্লে—"না আমার ধান কোটা হয় নি···তুমি কুটে নিও!"

বউটা বেরুলো। বাড়ীর ভেতর থেকে এসে সে আবার বল্লে—"ধান কুটতে গিয়ে দেখি, ধানের সঙ্গে কতকগুলো সোণার আংটী রয়েছে!"

—"তা থাক্। ময়নামতীর ঝোপের কাছে এক গর্ত্তের কাছে আসবার সময় দেখি, এক গাদা আংটী পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি কয়েকটা মাত্র নিয়ে এলাম···ফিরে যাবার সময় বাকীগুলো সব নিয়ে যেতে হবে। বোধ হচ্ছে, কোনও যকের ধন!"

খবর শুনে বউটার মন একেবারে দুলে উঠলো। সে মনে মনে ঠিক করলো যে, এই লোকটাকে বসিয়ে রেখে সে

এখনি সেখানে যাবে। বল্লে—"দেখো, চাষীর পো, তুমি একটু বসো, আমার একটু কাজ আছে, কাজ সেরে এসেই তোমাকে ভাত দেবো।"

বুধু বসে আছে, তার কিছুক্ষণ পরেই বাড়ীর ভেতর থেকে বউটার স্বামী বেরিয়ে এসে বুধুকে জিজ্ঞেস করলো—"হাঁ গা, অতিথি, আমার বউটা কোথায় গেছে জানো।"

বুধু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো—"এই যে এইখানে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিলো…তারপর দু'জনে ওধারে একসঙ্গে চলে গেলো।"

স্বামীটা রেগে যে-দিক বুধু দেখিয়ে দিলো, সেই দিকে ছুটে গেলো।

এই অবসরে বুধু দেখে একটী ফুটফুটে মেয়ে সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে। মেয়েটীর নতুন বিয়ে হয়েছে—মাথায় টকটকে সিঁদুর।

মেয়েটীকে ডেকে বুধু জিজ্ঞেস করলে—"হাঁ গা খুকী, তোমার কোন গাঁয়ে বিয়ে হয়েছে…"

মেয়েটী হেসে বল্লে—"পাশের ঐ সোণাতলীর গাঁয়ে।"

আর কালবিলম্ব না করে বুধু সোণাতলী গ্রামের দিকে রওয়ানা হলো।

ওধারে বউটা ময়নামতীর ঝোঁপ খুঁজে কোথাও কিছু না পেয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে বাড়ী আসছিলো। পথে স্বামীর সঙ্গে তার দেখা।

স্বামী স্ত্রীকে এই রকম ভাবে একলা দেখে আর কোনও কথাবার্ত্তা না বলে বেদম মার লাগাতে লাগলো।

পাঁচ

এদিকে কিছুক্ষণ পরে—

সোণাতলী গাঁয়ে গিয়ে বুধু সেই গাঁয়ের কোন্ বাড়ীর ছেলের সঙ্গে পাশের গাঁয়ের মেয়ের বিয়ে হয়েছে, লোকেদের কাছে খোঁজ নিয়ে তাদের বাড়ী গিয়ে উঠলো।

অনেক ডাকাডাকির পর যখন তাদের বাড়ী থেকে একটা লোক বেরিয়ে এলো, তখন বুধু কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বল্লে—"ওগো সর্ব্বনাশ হয়েছে, তোমাদের নতুন বউকে সাপে কামড়ে দিয়েছে। মেয়েটাকে তারা বনে কাট কুড়োতে পাঠিয়েছিলো··· সেই সময় কেউটেতে কামড়ে দিয়েছে···মেয়েটা একেবারে নীল হয়ে গেছে···তারা সব আসছে তোমাদের খবর নিতে।"

এই খবর না শুনে তারা তো সবাই কাঁদতে লাগলো। আর, ছেলের মার হলো ভয়ানক রাগ। সে বল্লো—"আহা, অতটুকু মেয়েকে কি বলে কাট কুড়োতে পাঠালো···"

এদিকে বুধু দেরী না করে দৌড়ে এসে সেই বউটীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত।

বুধুকে দেখে বউটী যেই রাগে যা-তা বলতে যাবে, অমনি বুধু হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলো—"ওগো সোণাতলীর গাঁ দিয়ে যাচ্ছিলাম···বড়ো সর্ব্বানাশের কথা শুনলাম···তোমাদের জামাই নাকি জলে ডুবে মারা গেছে···তারা সব আসছে তোমাদের খবর দিতে।"

এই খবর না পেয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে কেঁদে বেরিয়ে পড়লো জামাই বাড়ীর দিকে।

মাঝপথে দুইদলে অবিশ্রান্ত গলা জড়াজড়ি করে কাঁদে। বুধু এদিকে আড়াল থেকে সব দেখতে লাগলো।

কান্নার বেগটা একটু কমলে মেয়ের বাড়ীর লোকেরা শোনে যে, ছেলের বাড়ীর লোকেরা কাঁদছে—"ওগো অমন সোনার বউ কোথা গেলো গো···" কিন্তু আমাদের মেয়ে তো তোদের ঘর ভালোই আছে।



এদিকে ছেলের দলের লোকেরাও শুনলো মেয়ের দলের লোকেরা কাঁদছে—"ওগো অমন জামাই জলে ডুবে মরলো গো!"

জামাইএর মা সেই কথা শুনে রেগে গেলো। বল্লে—"হাঁগা, এ তোমাদের কেমন কথা গো! ছেলে আমার কখন জলে ডুবে মরলো? ছেলে আমার তো দিব্যি ভাল আছে···"

—"তবে, আমার মেয়েকেও তো সাপে কামড়ায় নি।"

—"তবে তবে ব্যাপারটা কি?"

তখন সোণাতলীর লোকেরা বুধুর বর্ণনা দিয়ে বল্লে যে, সেই লোকটা এসে এই খবর দিয়ে যায়।

বউটা তখন সব বুঝতে পারলো। সেই লোকটার কারসাজী এসব।

এমন সময় তারা দেখে যে বুধু হাসতে হাসতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

বুধুকে দেখে বউটা রেগে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে জিজ্ঞেস করলে—"তোমার এ কেমন কাজ?"

বুধু হেসে বল্লে—"আমার ভাইকে তুমি বলেছিলে যে যাবার পথে দুটো গল্প আর আসবার পথে দুটো গল্প বল্লে টাকাটা ফিরিয়ে দেবে···তাই ভাইএর হয়ে আমি যাবার পথে দুটো গল্প শুনিয়ে গেলাম, তুমি যদি বলো তো, আসবার পথেও এমনি দুটী গল্প শোনাতে পারি···"

বউটী সব জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে বল্লে—"দোহাই তোমার গল্প তোমায় আর শোনাতে হবে না···বাড়ী চলো তোমার ভাইএর টাকা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।"

বাড়ী গিয়ে টাকা নিয়ে বুধু তহশীলখানার দিকে চললো।

ছয়

অনেকদিন বুধুর দেখা না পেয়ে—

তহশীলদার ওধারে ভাবছিলো যে টাকা জমা দেবার দিন চলে যায়, তবুও বুধু আসে না কেন! এমন সময় টাকা-সমেত বুধু এসে হাজির।

—"কি ব্যাপার হে, বসো, বসো, এতো দেরী হলো যে এবার ?"

বুধু তখন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার তহশীলদারকে জানালো। তহশীলদার তো হেসেই খুন। বল্লে—"সে তোমার ভাই, কিন্ত অতো বোকা হলো কি রে ? বলে কিনা যে, সে রাস্তায় আসতে আসতে দেখতে পেলো একটা হরিণের একটা পা, একটা কাণ ও একটা শিং একসঙ্গে একটা তীরে বিঁধেছে !"

বুধু হেসে বল্লে—"তা হুজুর অসম্ভব নয়, কারণ সে হরিণটা হয়ত তখন পা দিয়ে তার কাণ চুলকোচ্ছিলো, সেই সময় ব্যাধ তীর ছুঁড়েছে।"

—"তা না হয় হলো, কিন্ত সে বলে যে সোণাতলীর মাঠে বাতাসে কুকুর কাঁদে।"

—"আজ্ঞে, হুজুর তাও অসম্ভব নয়। আপনি জানেন তো অনেক সময় চিলেরা ছোট ছোট কুকুর-ছানা ধরে নিয়ে গাছের ওপর নিয়ে যায়। গাছের ওপর থেকে কুকুর-ছানাগুলো কি রকম চীৎকার করতে থাকে। ও বোকা সেই শুনে মনে করেছে যে, বাতাসে কুকুর কাঁদে।"

তারপর তহশীলখানায় টাকা জমা দিয়ে বুধু বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

বাড়ীতে এসেই হুতুমের সঙ্গে দেখা…বুধু দেখলো, হুতুমের মুখ ভার। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় হুতুম বল্লে—"এ ক'দিন জমিটমি কিছুই চষা হয় নি; কারণ, বলদ কেনা হলো না।"

বুধু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—"তোমায় বলদ কিনতে টাকা দিলাম, সে টাকা তুমি করলে কি ?'

হতুম বল্লে—"আমার কোনও দোষ নেই ভাই···সবই আমার বরাতের দোষ। সারা বাজার ঘুরে কোথাও একটা বলদ পেলাম না···তখন ভাবলাম এতদূর এসেছি শুধুহাতে ফিরে যাবো···একটা ষাঁড় বিক্রীর জন্যে ছিলো। সেইটাই কিনে ফেল্লাম। ষাঁড়টা নিয়ে যখন ঘোষপাড়ার ভেতর দিয়ে আসছি, তখন কতকগুলো লোক আমার পেছনে লাগলো। তারা অনবরত আমায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—'এই বুড়ো ষাঁড় নিয়ে কি করবে গো, চাষার পো!' ছেলেগুলোও মজা পেয়ে গেলো···তারাও ঐ বলে আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগলো। তখন আমার মনে ভয় হলো···একে তো তহশীলে টাকা নিয়ে যেতে পারি নি বলে তুমি আমার ওপর রেগে আছো, তারপর একটা বুড়ো ষাঁড় কিনে নিয়ে যাবো। মনের দুঃখে ষাঁড়টাকে ছেড়ে দিলাম।"

এই ব্যাপার শুনে তো বুধু রেগে অস্থির। হতুমকে খুব খানিকটা গালাগালি দেওয়ার পর সে কোথায় ষাঁড়টাকে ছেড়েছে···কারা তাকে ক্ষেপিয়েছে···সব জেনে নিলো।

বুধুর কাছে গালাগালি খেয়ে হতুমের কিন্তু হলো ভয়ানক রাগ আর দুঃখু, সে ঠিক করলো যে, সে আর এদেশে থাকবে না। যেখানে হ'ক সে গতর খাটিয়ে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করে নেবে।

এই ভেবে সে সেই দিনই তাদের গ্রাম ছেড়ে কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লো।

অনেকক্ষণ পথচলার পর হতুম এক গ্রামে এলো··· সেখানকার যে জমিদার, সে আবার পাঠান···তবুও ভায়ের কাছে নিত্যি অপমান সহ্য করা যায় না! এই না ভেবে হতুম পাঠানের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলো।

পাঠান স্বয়ং এসে জিজ্ঞেস করলো—"তোমার কি চাই?"

হতুম বল্লে—"আজ্ঞে, একটা চাকরী চাই।"

—"চাকরী দিতে পারি কিন্তু আমার বড়ো কড়া শর্ত।"

—"যে কোনও শর্ত হ'ক…আমি চাকরী করবো এখানে!"

—"আমার শর্ত শুনে নাও…যদি তুমি চটে যাও…তা হলে আমি তোমার একটা চোখ উপড়ে ফেলবো। আর, আমি যদি চটে যাই, তা হলে তুমি আমার একটা চোখ উপড়ে ফেলবে। তা ছাড়া তোমার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হবে…আমার জমি তোমায় রোজ চষতে হবে…তার চারদিকে বেড়া দিতে হবে… আমার খাবারের জন্য রোজ শিকার আনতে হবে। নিত্য তোমায় এসব করতে হবে…হাঁ…তারপর আমার রান্না তোমায় রেঁধে দিতে হবে।"

খিদের জ্বালায় তখন হতুমের পেট জ্বলছিলো, সে অতোশতো কিছুই শোনেনি। সে শুধু কোনও রকমে আপাতত একটু আশ্রয় ও অন্ন খুঁজছিলো।

প্রাণের দায়ে সে বল্লে—"যে আজ্ঞে, হুজুর, তাতেই আমি রাজী হলাম।"

আট

পরের দিন সকাল বেলা—

হতুম লাঙ্গল নিয়ে জমী চষতে এসেছে। পাথুরে জমি… সে কি সহজে চষা যায়। হতুমের প্রাণ তো বেরিয়ে আসে। দুপুর হয়ে যায়, তবুও সামান্য জমিও চষা হলো না।

খিদেয় এধারে তার প্রাণ যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভেঙ্গে দেখে একটা একচোখো ঝি তাকে ডাকছে—"খাবার এসেছে, ওঠো।"

খাবারের নাম শুনে হতুম তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে বসলো। চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে বল্লে—"কৈ দাও।"

হতুম দেখলো, ঝির হাতে একটা পুঁটলী। পুটলীর মুখ ভাল করে গেরো দিয়ে বন্ধ।

ঝিটা বল্লে—"এই পুঁটলীর ভেতর খাবার আছে। তবে গিন্নী-মা বলেছেন যে গেরো খুলতে পারবে না…গেরো না খুলে খাবার নিতে হবে।"

হতুম দেখলো, এ আর এক বিপদ। গেরো না খুলে পুঁটলীর ভেতর থেকে খাবার নেওয়া যাবে কেমন করে। বিরক্ত হয়ে হতুম বল্লে—"যাও, খাবার খেতে চাই না…নিয়ে যাও।"

ক্ষিদের তাড়ায় আর কি করে, গাছের তলায় হতুম আবার ঘুমিয়ে পড়লো। সন্ধ্যে বেলা সূর্য্য পাটে বসতে হতুমের ঘুম ভাঙ্গলো। কিন্তু তার না হয়েছে মাটী চষা, না হয়েছে শিকার করা, না হয়েছে মাঠে বেড়া দেওয়া, না হয়েছে উনুনের কাঠ সংগ্রহ করা।

লাঙ্গলটা কাঁধে নিয়ে হতুম মনের দুঃখে বাড়ী ফিরছিলো। পথে পাঠানের সঙ্গে দেখা।

হতুমকে দেখেই পাঠান জিজ্ঞেস করলো—"আমার জমি চষেছো?

—"না।"

—"শিকার এনেছো?"

—"না।

—"উনুনের জন্যে কাঠ এনেছো?"

—"না।"

—"তবে সারাদিন কি করছিলে, গাধা!"

ক্ষিদেয় তখন হুতুমের পেট জ্বলে যাচ্ছিলো। সে রেগে বলে উঠলো—"করবো আর কি, আমার মুণ্ডুপাত করছিলাম ...এতো কাজ একজনে করতে পারে...যাও, কাজ আমি করবো না।"



—"বেশ কাজ না করো...কিন্তু তুমি রেগে কথা বল্লে কেন...চুক্তিমত তোমার একটা চোখ কাণা করে দিতে হবে।"

পাঠানের কথা শেষ হতে না হতে কোথা থেকে দু'জন যমকায় একচোখো লোক এসে হুতুমকে বেঁধে ফেলে তার একটা চোখ উপড়ে নিলে।

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একচোখ নিয়ে হতুম দেশে ফিরে এলো। বুধুর পায়ে কেঁদে পড়ে সে বল্লে—"আমার আর ভদ্রলোক হয়ে কাজ নেই···আমি চাষার ছেলে···মাটী চষবার জন্যে বাড়ীতেই রইলাম। আমাকে ও সব সাজে না।"

বুধু হতুমের কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনে ঠিক করলো যে··· যে-লোকেরা হতুমের কাছ থেকে ষাঁড়টা ঠকিয়ে নিয়েছে, আর যে পাঠান মনিব তার চোখ উপড়ে নিয়েছে···প্রথমে তাদের সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।

নয়

পরের দিন সকাল বেলা—

বাড়ীর ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক করে বুধু একটা গাধা কিনলো। গাধার গায়ে বেশ ভালো রকমের পোষাক এবং সঙ্গে আর একটা বুদ্ধিমান লোককে কি শিখিয়ে যে-গ্রামে হতুমকে ষাড় ঠকিয়ে নিয়েছিলো, সেই গ্রামের দিকে চল্লো।

এদিকে যারা হতুমকে ঠকিয়ে নিয়েছিলো, তারা সকলেই ছিলো ডাকাত। ঐ গ্রামটায় ছিলো তাদের আড্ডা। গ্রামে ঢুকতেই একজন ডাকাতের সঙ্গে বুধুদের দেখা হলো। বুধুর ভালো চেহারা দেখে ডাকাতেরা তাকে আদর করে ডেকে নিলো এবং রাতের জন্য একটা থাকবার জায়গাও ঠিক করে দিলো।

সকাল বেলা উঠেই ডাকাতেরা এসে বুধুর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।

বুধু গম্ভীর ভাবে চাকরটাকে বল্লে—"ওহে চাষীর পো, তোমার কাজ সারো।"

ডাকাতেরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। সকলেই একদৃষ্টে চেয়ে রইলো চাকরটা কি করে দেখবার জন্যে।

গাধাটা যেখানে বাঁধা ছিলো, চাকরটা সেখানেই ছিলো। ডাকাতেরা অবাক হয়ে দেখলো যে, চাকরটা গাধাটার পায়ের কাছে জমানো গোবর থেকে অনবরত টাকাই বার করছে। ব্যাপার দেখে ডাকাতেরা তো অবাক্!

ডাকাতেরা আপনাদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো —"এ লোকটাকে ছাড়া নয়। আদর-আপ্যায়ন করে একে আর এক-রাতের জন্যে রাখতেই হবে।"

ডাকাতরা আর এক রাত্তির থাকতে অনুরোধ করতেই বুধু ভয়ানক আপত্তি জানালো···গাধাটার শরীর খারাপ, সে আর দেরী করতে পারে না। অনেক পীড়াপীড়ি করার ফলে বুধু অবশেষে আর একরাত থেকে গেলো।

বলা বাহুল্য যে, চাকরটা ভোর বেলা উঠেই বুধুর কথামত গাধার গোবরের সঙ্গে টাকা মিশিয়ে রাখতো। সেদিনও ভোরবেলা সে তাই করতে লাগলো।

এদিকে ভোর না হতেই ডাকাতরা এসে হাজির। দেখে এসে সেই ব্যাপার! তারা তো একেবারে অবাক্!

তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বুধুকে জিজ্ঞাসা করলো—"মশাই, আপনার এ গাধাটা বিক্রি করতে হবে, বলুন আপনি কি নেবেন?"

বুধু অবাক হয়ে বল্লে—"সে কি মশাই, ঐ গাধাটাই আমার সর্ব্বস্ব। আমি ওকে বেচবো, কি বলেন? আর আপনারা কত টাকাই বা দিতে পারবেন? রোজ ভোর বেলা ওর গোবর থেকে আমি প্রচুর টাকা পাই।"

ডাকাতরা নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলো। তারা সকলে বুধুকে অনুরোধ করে বল্লে—"মশাই পাঁচ-হাজার টাকা দিচ্ছি··· গাধাটা দিয়ে যান, আর কথা বলবেন না।"

বুধু আর কি করে, অনুরোধে পড়ে অগত্যা গাধাটাকে দিয়ে দিতে হলো, এই ভাব করে গুণে পাঁচহাজার টাকা নিয়ে গাধাটা তাদের কাছে রেখে রওয়ানা হলো।

এদিকে চাকরটার ভয়ানক ভয় হয়ে গেছে। পথে আসতে আসতে সে বল্লে—"হুজুর ওরা তো আমাদের বাড়ী চেনে…কাল সকালে যখন সব বুঝতে পারবে, তখন কি হবে?"

বুধু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে—"আরে অতো ভাবো কেন? দাঁড়াও না, দেখো ওদের আরও কি নাস্তানাবুদ করি।"

পথে ফেরবার সময় বাজার থেকে বুধু ঠিক এক রকম দেখতে দুটো খরগোস কিনে নিলো। বাড়ী এসে বুধু বউকে ডেকে সমস্ত ব্যাপার জানালো। তারপর একটা খরগোস বউএর কাছে রেখে দিলো আর একটা সঙ্গে করে মাঠে নিয়ে গেলো।

যাবার সময় বলে গেলো—"দেখো, কতকগুলো লোক আমাকে খুঁজতে আসবে…তাদের বলো যে আমি মাঠে কাজ করছি, সেখানে দেখা করতে…আর তুমি জনা-সাতেকের মতো রান্না তৈরী করে রাখবে।"

যাবার সময় বউএর কাণে কাণে বুধু খরগোস সম্বন্ধে কি করতে হবে, তাও শিখিয়ে দিয়ে গেলো।

দশ

ডাকাতদের আড্ডা থেকে বুধুর চলে আসবার পর—

ডাকাতরা ওধারে সারারাত গাধাটাকে নিয়ে জেগে বসে আছে। আশায় তাদের সকলের বুক কাঁপছে…কারুরই চোখে ঘুম নেই।

সকালবেলা দু'জনে মিলে গাধাটার কাছে গিয়ে দেখে এক গাদা গোবর। পরম-আনন্দে তারা তা ঘাঁটতে লাগলো, কিন্তু কিছুই পেলো না।

তখন তাদের মধ্যে একজন রেগে বলে উঠলো—“বেটা আমাদের ঠকিয়ে গেছে, চল্ বেটার বাড়ী গিয়ে বেটাকে খুন করে আসি।”

ছ'জন ডাকাতে মিলে তারা বুধুর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো। বুধুর বাড়ী এসে তারা ডাকাডাকি সুরু করে দিলো।

বুধুর বউ বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে জানালো যে, বুধু মাঠে কাজ করছে। ডাকাতরা কালবিলম্ব না করেই মাঠে একেবারে বুধুর কাছে গিয়ে হাজির।

এদিকে ডাকাতরা চলে যেতেই বুধুর কথামত যে-খরগোসটা তার সঙ্গে ছিল, সেটা বাড়ীর দরজার কাছে বেঁধে রাখলো।

বুধু দূর থেকেই তাদের দেখতে পেয়েছিলো। তারা আসতে না আসতেই বুধু এগিয়ে গিয়ে তাদের আদর করে ডেকে এনে গাছের ছায়ায় বসালো।

তারা বসতে না বসতেই বুধু সঙ্গের খরগোসটার পিট চাপড়ে বল্লে—“যারে বাছা, তোর মাকে বলগে যা যে, জন-সাতেকের ভাত করতে হবে, শিগ্‌গির যা…”

এই বলে খরগোসটার পিঠ চাপড়ে বুধু তাকে ছেড়ে দিলো। ছাড়া পেয়ে খরগোসটা ধীরে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ব্যাপার দেখে ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। একে তো এখন মারা হবে না… খরগোসের ব্যাপারটা দেখা যাক্!

তারা বুধুকে আর কোনও কথা তখন বল্লে না। কিছুক্ষণ গল্প করার পর বুধু তাদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে চল্লো।

বাড়ী আসতেই ডাকাতগুলো অবাক হয়ে দেখে যে, সেই খরগোসটাই তো দরজায় বাঁধা।

ডাকাতরা মনে মনে ভাবলো এ রকম একটা খরগোস থাকলে তো মন্দ হয় না।

খেতে বসবার সময় ডাকাতরা দেখলো ঠিক সাতজনের খাবার তৈরী। তারা তো অবাক্।

খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হয়-হয়—সেই সময় বুধু তার বউএর কাছে আরও ভাত চাইলো। অনেকক্ষণ চাওয়ার পর বুধুর বউ এসে বল্লে—"ভাত তো আর নেই।"

সেই কথা না শুনে বুধুর ভয়ানক রাগ হয়ে গেলো। রেগে না উঠেই বউটাকে ভীষণ জোর এক চড় লাগিয়ে দিলো। বউটা সেই চড়ের ঘায়ে একেবারে মড়ার মত হয়ে শুয়ে পড়লো।

ডাকাতগুলো দেখলো, এ কি বিপদ। শেষকালে কি খুনের দায়ে পড়তে হবে নাকি? তারা উঠে দেখে, সত্যি সত্যি বউটা আর নড়ে-না চড়ে-না।

বুধুর কিন্তু সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। সে আপনার মনে বাকি ভাতগুলো খেয়ে দিব্যি আঁচাতে উঠলো।

তার হাবভাব দেখে ডাকাতগুলো তো আরও অবাক্।

—"ওহে বুধু, আমাদেরও শেষকালে খুনের দায়ে ফেলবে নাকি? বউটাকে মেরে ফেল্লে?"

বুধু তেমনি অবিচলিত থেকে বল্লো—"হাঁ, ভারী বদ্‌মায়েস হয়েছে···খানিকক্ষণ মরে থাকাই ভালো।"

—"খানিকক্ষণ মরে থাকবে কি হে। মানুষ মরে তো চিরকালের জন্যেই।"

বুধু আঁচিয়ে এসে ঘরের কোণ থেকে একটা বেতের ছড়ি এনে মরা বউটার গায়ে তিনবার ঠেকাতেই বউটা নড়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পরেই বউটা উঠে ঘরের ভেতর চলে গেলো।

ডাকাতরা ব্যাপার দেখে তো একেবারে অবাক্। মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, এতো বড়ো আশ্চর্য্য ছড়ি!

বুধু তাদের রকম-সকম দেখে গম্ভীর হয়ে বল্লে—"এই ছড়িটা আমি এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পাই। এক বছর সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে ঘোরার ফলে এই দৈব ছড়িটা আদায় করতে পেরেছি। এটা আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ।"

মানুষের এমনি লোভ! ডাকাতগুলো আগের কথা সব ভুলে গিয়ে সেই খরগোস আর ছড়িটা নেবার জন্যে মিনতি জানালো।

বুধুতো কিছুতেই দেবে না। তারা যতো মিনতি জানায়… বুধু ততো আপত্তি করে।

শেষকালে তারা তাদের গ্রামে ফিরে গিয়ে গ্রামের সমস্ত গণ্যমান্য লোকদের ডেকে নিয়ে এলো। তারা সকলে বুধুর কাছে মিনতি জানালো।

একজন তাদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে বল্লে—"তুমি ও দুটোর জন্যে কি চাও বলো…তাই দেবো আমরা!"

বুধু এতো লোকের অনুরোধ এড়াতে না পেরে কি আর করে…অনেক ভেবে-চিন্তে সে আট হাজার টাকা চাইলো। ডাকাতরা তাদের সমস্ত টাকা জড় করে এনে গুণে আট হাজার টাকা বুধুর কাছে দিয়ে খরগোস আর ছড়িটা নিয়ে চলে গেলো।

ডাকাতরা চলে যেতেই বুধু চাকরের মতো বেশভূষা করে বেরিয়ে পড়লো। যাবার সময় হুতুমকে বলে গেলো—"এবার তোমার সেই পাঠানকে জব্দ করে, তবে ফিরে আসবো।"

এগারো

এদিকে ডাকাতরা পরমানন্দে খরগোস আর ছড়ি নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

দলের মধ্যে যে ছিলো মোড়ল, সেই প্রথম খরগোস আর ছড়িটা ব্যবহার করতে পেলো।

পরের দিন সকালবেলা মোড়ল মাঠে বেরোবার সময় সঙ্গে খরগোসটাকে নিয়ে গেলো, আর বাড়ীতে বলে গেলো যে, যতো জনের খাবার দরকার হবে বা যা খাবার দরকার হবে, এই খরগোসটাকে দিয়ে বলে পাঠাবো।

মাঠে কাজ করতে করতে দুপুর হয়ে গেলো দেখে মোড়ল ভাবলো যে, এখন আর বাড়ী গিয়ে কি হবে, খাবারটা এখানে আনিয়ে নি।

এই ভেবে সে খরগোসটার পিট চাপড়ে দড়ি খুলে দিয়ে বল্লে—"বাছা, বাড়ী যাও, বাড়ী গিয়ে বউকে খাবারটা শিগ্‌গির এখানে নিয়ে আসতে বলো, ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে।"

খরগোসটা ছাড়া পেয়ে এদিক-ওদিক দেখে সামনের পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। বনের খরগোস বনে চলে গেলো।

বেলা ব'য়ে যায়, ওধারে আর খাবার নিয়ে আসে না। বিকেল হয়ে যায়, খাবার আর আসে না। ক্ষিদের জ্বালায় আর রাগে উন্মত্ত হয়ে বাড়ীতে ছুটে এসে দেখে বউ মনের আনন্দে ঘুমুচ্ছে। রাগে তার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠলো।

রাগের মাথায় বউটার মাথায় জোরে একটা কুড়ুলের ঘা বসিয়ে দিলো। বউটা চমকে উঠে এক চোটেই মরে গেলো।

গোলমাল শুনে বাড়ীর অন্য সব লোকেরাও জড় হয়ে পড়লো। বউটার অবস্থা দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগলো। কিন্তু মোড়ল গম্ভীর হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলো, যেন কিছুই হয় নি।

সবাই তখন মোড়লকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—"হাঁ গা, বউটাকে মারলে কেন?"

—"মারবো না? খরগোসটাকে দিয়ে বলে পাঠালাম যে, খাবারটা মাঠে পাঠিয়ে দিতে…তা না, পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে…তা তোমাদের ভাববার দরকার নেই…আমি এখনই ওকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি।"

সবাই অবাক হয়ে গেলো—"মরা মানুষ বাঁচবে কি করে গো!"

মোড়ল ঘরের কোণ থেকে ছড়িটা নিয়ে এসে গম্ভীর ভাবে মরা বউটার গায়ে তিনবার ঠেকিয়ে গম্ভীর স্বরে ডাকলো—"এইবার ওঠো!"

তখন মোড়লের হুঁস হলো। লোকটা এবারেও কি ঠকিয়েছে? খোঁজ, খোঁজ, খরগোসটা কোথায় গেলো! কিন্তু খরগোসকে আর পাবে কোথায়? সে তখন নিশ্চিন্তি হয়ে কোথায় কোন বনে ঝোপের অন্ধকারে আরামে ঘুমুচ্ছিলো!

মোড়ল মাথায় হাত দিয়ে বসলো। তাই তো একি ভয়ানক সর্ব্বনাশ! তাদের মতো দুর্দান্ত লোক আর সে অঞ্চলে কেউ ছিলো না…তাদের যে অমন করে বারে বারে ঠকিয়েছি…সে লোক কি ভয়ানকই না হবে।

তাই তারা ঠিক করলে, যা হবার তা হয়ে গেছে, আর তারা বুধুর কাছে যাবে না…লোকটা যাদু জানে! হয়ত আবার কি একটা ঠকিয়ে গছিয়ে দেবে।

বারো

ওধারে চাকরের সাজগোজ করে—

বুধু সেই পাঠানের সন্ধানে চলেছে। পূরো একটা দিন হাঁটবার পর পাঠানের জমিদারীতে গিয়ে সে পৌঁছলো।

পাঠানের বাড়ীর দরজার কাছে এসে কড়া নাড়তেই পাঠানটা বেরিয়ে এলো। বুধুকে দেখেই সে জিজ্ঞাসা করলো—"কি চাই তোর ?"

—"হুজুর, আমি একটা চাকরী চাই।"

—"চাকরী দিতে পারি···তবে আমার একটা শর্ত আছে, সেটা যদি স্বীকার না করো, তা হলে তোমার চাকরী এখানে হবে না।

—"কি শর্ত হুজুর ?"

—"আমার এখানে চাকরী করবার সময় তুমি যদি রাগো, তাহলে তোমার একটা চোখ আমি উপড়ে নেবো···আর আমি যদি রাগি আমার একটা চোখ তুমি উপড়ে নিতে পারো।"

—"যে আজ্ঞে, হুজুর, আমি সেই শর্তেই রাজী হলাম"

—"কিন্তু আমার কাজ কি তাও তো জান না···"

—"বলুন, হুজুর ?"

—"রোজ তোমাকে আমার জমীতে লাঙ্গল দিতে হবে··· লাঙ্গল দেওয়া হয়ে গেলে তার চারদিকে বেড়া দিতে হবে··· তারপর জঙ্গল থেকে আমার খাবার জন্যে শীকার করে আনতে হবে···সেই সঙ্গে উনুন ধরাবার জন্যে কাঠও সংগ্রহ করে আনতে হবে এবং সব কাজ সেরে আমার রান্না তৈয়ার করতে হবে।

—"আচ্ছা, আমি তাই করবো।"

এই বলে ঠিকঠাক হয়ে গেলে সে পাঠানের বাড়ীতে সে-রাতের মতো ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন সকাল বেলা বলদজোড়া আর লাঙ্গল নিয়ে সে জমি চষতে চল্লো।

পেল্লায় মাঠ…একজন লোক একমাসেও তা চষতে পারে না।

বুধু শুধু মাঠের চারিদিকের জমি একহাত করে চষে… চারকোণে চারটে বাবলা গাছ লাগিয়ে রাখলো।

মাঠে বসে আছে, এমন সময় বুধু দেখে যে একটা এক-চোখো ঝি একটা পুঁটলী করে কি নিয়ে আসছে।

সামনে এসে ঝিটা বলে—"এই পুঁটলীতে খাবার আছে। তবে পুঁটলীর গেরো খুলে খাবার নিতে পারবে না। এখানকার তা নিয়ম নয়।"

বুধু মাঠ খুঁজে একটা লোহার শিক নিয়ে এসে পুঁটলীর তলাটা ফুটো করে ফেল্লো।

তলা ফুটো হয়ে যাওয়াতে সমস্ত ভাত বুধুর আঁচলে এসে পড়লো। খালি পুঁটলী নিয়ে ঝি চলে গেলো।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বুধু গাছের তলায় একটু ঘুমিয়ে নিলে। তারপর বিকেলের দিকে উঠে বাড়ীর দিকে যেতে মাঠ থেকে একমুঠো ঘাস তুলে নিলে। তাই হলো ঘোড়ার খাওয়া।

আর উনুনের কাঠ? বন তো অনেক দূরে। বুধু লাঙ্গলটা ভেঙ্গে কাঠ তৈরী করলো। এখন শিকারের কি করা যায়?

বুধুর মনে পড়লো যে, পাঠানটার মঙ্গলু বলে একটা কুকুর আছে…সেটা বাড়ীর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়।

সন্ধ্যের মুখে বাড়ী আসবার পথে বুধু মঙ্গলুকে ধরে মেরে ফেল্লো। চামড়া ছাড়িয়ে তার মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটলো।

তারপর বাড়ী আসতেই পাঠান-প্রভুর সঙ্গে তার দেখা হলো।

বুধুকে দেখেই পাঠান গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলো—

—"জমি চষেছো ?"

—"হাঁ, হুজুর।"

—"চারকোণে বেড়া দিয়েছো ?"

—"হাঁ, হুজুর।"

—"আমার ঘোড়ার জন্যে ঘাস এনেছো ?"

—"নিশ্চয়ই, হুজুর।"

—"উনুনের কাঠ ?"

—"অবিশ্যি।"

—"আমার শিকার"

—"তাও এনেছি, হুজুর ?"

পাঠান মনে মনে বিস্মিত হয়ে বল্লে—"তবে আমার খাবার তৈরী করগে যাও এখন।"

রান্নাঘরে গিয়ে বুধু কুকুরের মাংস রেঁধে এনে পাঠানের সামনে ধরে দিলো।

রোজ খাবার সময় পাঠানটা পোষা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে খায়। খেতে বসেই পাঠানটা ডাকলো—"মঙ্গলু!…মঙ্গলুটাকে আজ সন্ধ্যে থেকে দেখছিনে কেন ?"

বুধু এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো। সে গম্ভীরভাবে বল্লে—"হুজুর, মঙ্গলু তো আর আসতে পারবে না।"

—"কেন ?"

—"মঙ্গলু আপনার কাছে কি করে আর আসবে… আপনি যে মঙ্গলুরই মাংস খাচ্ছেন!"

রাগে পাঠানটার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠলো—"পাজী-বদমায়েস…তুই আমাকে শেষকালে কুকুরের মাংস খাওয়ালি!"

বুধ্ধু মুচকে হেসে বল্লে—"হুজুর, আপনি রাগ করছেন…"

পাঠানটা হঠাৎ রাগ সামলে নিয়ে থতমত খেয়ে বল্লো—"কৈ আমি তো রাগিনি…আমি শুধু জোরে কথা বলছিলাম যে, তুই আমাকে কুকুরের মাংস খাওয়ালি…"

তক্ষণি সমস্ত খাওয়া ফেলে দেওয়া হলো। সেদিনকার মতো পাঠানের আর মাংস খাওয়া হলো না।

সকালবেলা উঠেই বুধ্ধুকে ডেকে পাঠানটা বল্লে—"তোমাকে আর রাঁধতে হবে না…যাও বলদ আর লাঙ্গল নিয়ে এখন জমি চষোগে যাও…

—"হুজুর, জমি চষবো কি রকম করে?"

—"কেন?"

—"হাল আর লাঙ্গল যে নেই!"

—"কেন, কালই যে তোমাকে নতুন হাল আর লাঙ্গল দেওয়া হলো?"

—"হুজুর, সেগুলো তো কাঠ করে কালই আপনার উনুন জ্বাল দেওয়া হয়েছে?"

—"কি! আমার লাঙ্গল ভেঙ্গে আমারই উনুনে কাঠ জ্বালিয়েছো তুমি…পাজী, বদমায়েস…"

তেমনি একটু হেসে বুধ্ধু বল্লে—"হুজুর ভুলে যাচ্ছেন… আপনি আবার রাগছেন…"

থতমত হয়ে পাঠান বলে উঠলো—"কৈ, না, আমি তো

রাগি নি…তবে, দেখো, তোমাকে নিয়ে আমার চলবে না… যাও, তুমি তোমার বাড়ী ফিরে যাও…"

—"সে বল্লে তো হবে না, হুজুর! বাড়ী আমার থাকবে যদি, ভিন্-গাঁয়ে চাকরী করতে আসবো কেন, বলুন? আর আপনি যখন আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন…সুতরাং চুক্তিমত আপনার একটা চোখ আমি নিতে পারি…"

—"কে বল্লে আমি রাগ করেছি…আমি শুধু বলছিলাম যে, এ-রকম ব্যবহার করলে তোমার এখানে থাকার সুবিধে হবে না…তা তোমার থাকতে ইচ্ছে থাকে তো থাকতে পারো …তোমার কিন্তু কোনও কাজ করতে হবে না…"

রাতে শুয়ে শুয়ে পাঠানটা ভাবতে লাগলো, এ তো বড়ো বিপদ্! একে এখন ছাড়ানোও তো যায় না! তখন পাঠানটার একটা গল্প মনে পড়লো…

একবার এক নদীর ধার দিয়ে দুই বন্ধু বেড়াচ্ছিলো। এমন সময় নদীর স্রোতে দুই বন্ধুতে দেখলো, একটা কালো কম্বলের মতো কি যেন ভেসে আসছে।

কম্বল মনে করে এক বন্ধু জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে তাকে ধরলো, কিন্তু তীরে আর উঠে আসতে পারে না!

তীরের বন্ধুটী যতই ডাকে…সে ততই কম্বলকে জড়িয়ে স্রোতের মুখে ভেসে চলে। শেষে তীরের বন্ধুটী চীৎকার করে বলে উঠলো—"বন্ধু, কম্বল ছেড়ে দিয়ে তুমি চলে এসো…"

বন্ধুটী তেমনি ভাসতে ভাসতে বল্লো—"আমি তো কম্বলকে ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু কম্বল যে আমাকে ছাড়ে না!"

যেটাকে কম্বল মনে করেছিলো, সেটা কিন্তু আসলে একটা ভাল্লুক!

তেরো

এমনি করেই দিন যায়—

বুধু খায়-দায় আর ঘুরে বেড়ায়।

ভালোয় ভালোয় কিছুদিন কেটে যাবার পর পাঠানের দূর গ্রাম থেকে এক বিয়ের সম্বন্ধ এলো।

মেয়েটীর রূপের বর্ণনা শুনে পাঠান তাকে বিয়ে করলো।

বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে।

রওয়ানা হবার সময় তার মনে হলো, দূরের পথ, ভালোমন্দ তো বলা যায় না, পথে কতো রকম লোক আছে··· চাকরটাকে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

এই না ভেবে পাঠানটা ঠিক করলো যে চাকরটাকেও সে সঙ্গে নেবে।

শুভক্ষণ দেখে বুধু মনিবের সঙ্গে রওয়ানা হলো।

পথে যেখানে রাত হয়ে এলো, সেটা একটা গ্রামের সীমানা। সেখানে দেখা গেলো যে, আরও অনেক লোক মাঠে তাঁবু ফেলে আছে।

বুধু বল্লে—"গ্রামের ভেতর না গিয়ে এইখানেই রাত কাটিয়ে দেওয়া যাক্···কার বাড়ীতে গিয়ে উঠবো, তার ঠিক নেই···আর এখানে আরও অন্য সব পথিকও তো রয়েছে···"

পাঠানও তাতে রাজী হলো।

বুধু কাঠ কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বেলে মনিবের জন্যে রুটী তৈরী করে দিলে।

খাওয়া শেষ করে সারাদিনের ক্লান্তির পর কাপড়চোপড় মুড়ি দিয়ে শুতে-না-শুতেই পাঠানটা ঘুমিয়ে পড়লো।

বুধু জেগে পাহারা দিতে লাগলো। কিন্তু তার মাথায় নানান্ রকমের চিন্তা বোলতার মতো তখন বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

সে ভাবছিলো, এবার এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে পাঠানটা রেগে একটা কিছু করে বসে...যে তার ভাইএর চোখ উপড়ে নিয়েছে, তার চোখ উপড়ে নিয়ে যেতে হবেই...

ঘুরতে-ফিরতেই নজরে পড়লো যে কতকগুলো রাখাল তাঁবু ফেলে রাত কাটাচ্ছে।

মনে মনে একটা মতলব এঁটে বুধু রাখালদের তাঁবুতে গেলো। সেখানে দেখতে দেখতে সকলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলে।

তাদের মধ্যে থেকে এক ধূর্ত্ত লোক বেছে নিয়ে বুধু তাকে আড়ালে নিয়ে এসে বল্লে—"দেখ, একটা কাজ করতে হবে। আমাদের ঐ যে ছোট্ট ঘোড়াটা রয়েছে, দেখছো, ওর বদলে একটা হৃষ্টু ষাঁড় তোমাকে দিতে হবে...আমার মনিবকে আমি একটু জব্দ করতে চাই। সকাল হলেই তোমাদের যেন ষাঁড় হারিয়েছে...খোঁজ করতে করতে আমাদের ওখানে আসবে। আর, লোকটাকে ষাঁড়-চোর বলে বেদম মার দেবে...তারপর যা হয় আমি করবো।"

ষাঁড়ের বদলে ঘোড়া পাবে...রাখালটা তো আর আপত্তিই করলো না।

বুধু ভোর না হতেই ঘোড়াটেকে সরিয়ে দিয়ে ষাঁড়টাকে সেই গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলো।

তখনও ভোর হয়নি...বেশ অন্ধকার আছে। এমন সময় বুধু গিয়ে তার মনিবকে ঠেলে তুললো...

—"হুজুর, এই বেলা না রওয়ানা দিলে, সেখানে পৌঁছতে আজও পারবো না...উঠুন ঘোড়া তৈরী..."

দু'বার পাশ ফিরে কোনও কথা না বলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘুমের ঘোরে গাছের তলায় গিয়ে পাঠান যেমন ঘোড়া মনে করে ষাঁড়টার ওপর বসতে যাবে…অমনি দুষ্টু ষাঁড়টা পেছনের পা ছুঁড়ে শিং নেড়ে এক লাফ দিয়ে উঠলো…আর যাবেন কোথায়! সেই বিপুল শরীর নিয়ে একেবারে ঘাড়মুখ



গুঁজে মাটীর উপর চীৎপটাঙ। এমন সময় পেছন দিক থেকে রাখালগুলো না উঠে চীৎকার শুরু করে দিলে—"ওরে ষাঁড় পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে…"

তারপর পাঠানের কাছে এগিয়ে এসে তারা সবাই এক-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—"চোর! চোর!"

যেমন বলা, আর তেমনি মার! কিছুক্ষণ পরে রাখালরা পাঠানকে ধরে বল্লে—"আদালতে চলো।"

পাঠানটা রাগে তখন ফুলছে। বুধুর দিকে চেয়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"কি, তুই চুপ করে রইচিস যে!"

বুধু বল্লে—"আপনি যে কখন ষাঁড় চুরি করে এনেছেন, তা কি করে জানবো..."

পাঠানটা দেখলো, এ তো আর এক বিপদ! আদালতে তার নিজের চাকর যদি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়...তবে তো সে গেছে! তখন কি আর করে, পাঠানটা বুধুর খোসামোদ করতে লাগলো!

—"কি আর হবে, আমার বরাতে ছিল, যাও এই টাকা নিয়ে আর একটা ঘোড়া নিয়ে এসো..."

কিন্তু রাখালরা তো ছাড়ে না। তখন বুধু এগিয়ে গিয়ে রাখালদের দূরে নিয়ে গিয়ে কি পরামর্শ করলো। তারপর তাদের ষাঁড় তাদের ফিরিয়ে দিলো...সেই সঙ্গে কিছু টাকাও দিলো...আর নিজে গিয়ে সেই ঘোড়াটাকেই আবার নিয়ে এলো।

চৌদ্দ

রাখালগুলোকে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি করে—

সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা নিয়ে পাঠানটা আবার শ্বশুরবাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো।

যে গ্রামে পাঠানটার শ্বশুর-বাড়ী...সেই গ্রামের ভেতর ঢুকে পাঠানটা বল্লে—"ওহে শুনছো, আমি এখানে স্নান সেরে নি...তুমি ছুটে গিয়ে আমার খাবার তৈরী করে রাখতে বলে এসো...আমার ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে?"

—"যে আজ্ঞে হুজুর"…বলে বুধু গ্রামের ভেতর চলে গেলো।

পাঠানটার শ্বশুর-বাড়ী আসতেই তারা সকলে বেরিয়ে এসে ব্যগ্র হয়ে বুধুকে নতুন জামাইএর কুশল জিজ্ঞাসা করলো।

বুধু সবাইকে আশ্বস্ত করে জানালো—"আপনাদের জামাই গ্রামে এসে পৌঁচেছেন…তবে তাঁর শরীর ভয়ানক খারাপ… ডাক্তাররা তাঁকে যা বলেছেন…তা ছাড়া তিনি আর কিছুই খাবেন না…আর সেই কথা বলবার জন্যেই তিনি আমাকে আগিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন…"

—"তবে, তার জন্যে কি রান্না হবে?"

—"সামান্য একটু বাটনা দিয়ে শুধু শামুকের ঝোল… এই হলেই তাঁর হয়ে যাবে…আর তাতে যেন নুন না পড়ে… আর আমার…আমি সামান্য চাকর…আমার ডালভাত হলেই হবে…"

একজন লোক বলে উঠলো—"সে কি হয়…জামাইএর না হয় অসুখ…তুমি জামাইএর চাকর, কুটুম বাড়ী এসেছো… শুধু ডালভাত খেতে যাবে কেন?"

খাওয়ার বন্দোবস্ত করে বুধু পাঠানকে আনতে চলে এলো।

পাঠান নতুন শ্বশুড়বাড়ী এসেছে, ভারিক্কী চালে থাকে। সবাই এসে জিজ্ঞাসা করে—"এখন শরীরটা কেমন আছে?"

পাঠানটা মনে মনে ভাবে, বুধু বুঝি মারের কথা সব বলে দিয়েছে। মুখে বলে—"বেশ ভালোই ছিলাম…এখন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি…একটু শীগগির বিশ্রাম করতে চাই…"

তারা তাড়াতাড়ি শামুকের ঝোল একবাটী সামনে এনে ধরলো। আর তারই একটু দূরে বুধুকে পাঁচব্যজন দিয়ে ভাত বেড়ে দিলো।

পাঠানটার তখন ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিলো অথচ নতুন শ্বশুর-বাড়ী কিছুই বলতে পারে না। ওধারে বুধু থাল থাল ভাত খায় আর আড়-চোখে মনিবের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

কোনও রকমে চোখকাণ বুজিয়ে সেই ঝোলটুকু খেয়ে নিয়ে সে রাত্তিরের মতো পাঠানটা ঘুমিয়ে পড়লো। বুধুও সেই ঘরে শুলো।

পনেরো

গভীর রাতে—

পাঠানটার পেট গুলিয়ে উঠেছে।

সে তাড়াতাড়ি উঠে বুধুকে ডেকে বল্লে—"দেখ, চুপিচুপি উঠে বাইরে পাইখানায় যেতে হবে—"

বুধু বল্লে—"এতো রাত্তিরে চুপিচুপি চলাফেরা করলে, কে আবার চোরটোর মনে করবে। তার চেয়ে বরঞ্চ আমি একটা সরা এনে দিই এখানে ওকাজটা এখানেই হয়ে যাক্…ভোর না হতেই আমি এসে সরাটা ফেলে দেবো…"

প্রাণ তখন যায় যায়। পাঠানটা কি আর করে! সেই ঘরেই সরাতেই ও কাজ সারা হলো। কিন্তু ভোর না হতেই পাঠানটা উঠে চেয়ে দেখে বুধু বিছানায় নেই!

ক্রমশঃ একটু একটু করে সূর্য্যের আলো দেখা দিতে লাগলো!

এখনই হয়ত তারা এসে পড়বে…ভাবতে লজ্জায় পাঠানটার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিলো…আর ততো রাগ হচ্ছিলো বুধুর ওপর…অবশেষে কি আর করে, সরাটা কাপড় চাপা দিয়ে নিজেই ফেলে দিতে চল্লো।

বুধু ওধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো। যেমন সরা নিয়ে পাঠানটা বাড়ীর বার না হয়েছে···অমনি বাড়ীর লোক-জনদের ডেকে বুধু বল্লে—"ওগো, তোমাদের জামাই রাগ করে চলে যাচ্ছে! কালকের রাত্তিরের খাওয়া পছন্দ হয় নি···এখন ফেরাও ওকে···অনেক অভিমান করবে···অভিমানী লোক কিনা···কিন্তু তোমরা ছেড়ো না কিছুতেই···"

তারা চেয়ে দেখে সত্যি সত্যিই জামাই গুটিগুটি চলেছে। ছেলেবুড়ো সবাই জামাইকে ধরবার জন্যে ছুটলো। শ্বশুর এগিয়ে গিয়ে বলে—"বাবা, আমাদের ওপর কি রাগ করতে আছে···চলো, বাবা, ফিরে চলো···"

পাঠানটার তখন রাগে আর লজ্জায় বুক শুকিয়ে এসেছে··· বুধুকে পেলে সে ছিঁড়ে খায়···

ওধারে শশুরবাড়ীর সমস্ত লোক তাকে ততই অনুরোধ করে—"কেন চলে যাচ্ছেন ?"

পাঠানটা দেখলো বিপদ। সে যতোই বলে, সে চলে যায় নি···সে শুধু একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছে···ততোই কেউ বিশ্বাস করে না···

শেষকালে শ্বশুর এগিয়ে এসে জামাইএর হাত চেপে ধরলো। যেমন হাত চেপে ধরা, অমনি কাপড়ের ভেতর থেকে সরাটা মাটীতে পড়ে গেলো।

ব্যাপার দেখে সবাই অবাক্। লজ্জায় অন্য সমস্ত লোক সরে গেলো।

বুধু এগিয়ে আসতেই পাঠানটা রেগে তাকে তখনই মেরে ফেলবে ভাবলো! কিন্তু মনে মনে ভয় হলো, ভাবলো, এ লোকটা যা খুশী তাই করতে পারে···একে কোনও রকমে সন্তুষ্ট করে বিদেয় করতে হবে···নইলে জীবনে শান্তি নেই!

তখন পাঠানটা বল্লে…"দেখ, আমি তোমার কাছে সত্যিই হার মেনেছি। কি চাও বলো…তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে…দোহাই…দোহাই তোমার…"

তখন বুধু সমস্ত ঘটনা বল্লে…তার ভায়ের চোখ উপড়ানো পর্য্যন্ত। পাঠানটা তখন অনুতপ্ত হয়ে বল্লে—"দেখ আর কখনও ও কাজ করবো না…আর তোমার ভাইএর চোখের জন্যে আমি পাঁচহাজার টাকা দেবো…আর তা ছাড়া তোমাকেও পাঁচহাজার টাকা দেবো…বলো তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে ?"

বুধু রাজী হলো। সেই দশহাজার টাকার পুঁটলী বেঁধে সে আবার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো।

এখন আর তাকে তহশীলেও রোজ ছুটতে হবে না…তার ভাইকেও আর বলদ ঠেলতে হবে না…ঘরে বসে সুখে লোকজন খাটিয়ে দিন চলে যাবে…সেই মধুর দিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে বাড়ীর দিকে চল্লো।

আমার গল্পটীও ফুরোলো।

